

এশিয়ার প্রথম আয়ুর্বেদিক কলেজ কলকাতাতেই, বিস্মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠাতা যামিনীভূষণ

শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় | September 21, 2023

বহুদিন ধরেই অযত্নে পড়েছিল ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের ২৯ নম্বর বাড়িটা। যাকে বলে লজঝড়ে অবস্থা। হঠাৎই শুরু হল সেই বাড়ি মেরামতির কাজ। চুনকাম সেজে উঠল সুরকির দেওয়াল। ভ্যানে করে আসতে লাগল টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ। আর এই ঘটনাতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল ফড়িয়াপুকুরে। ব্যাপার কী? গুপ্তন উঠল সেখানে নাকি মেডিক্যাল কলেজ খুলবেন কোনো এক বদ্যিমশাই। কেউ কেউ সাবাসি দিলেও, ঠাট্টা-মশকরা চলতে থাকল সমাজে। এ আবার হয় নাকি! কিন্তু হল তেমনটাই। কিছুদিনের মধ্যেই চালু হয়ে গেল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসতে শুরু করল শিক্ষার্থীরা। সেইসঙ্গে শুরু হল বিনামূল্যে চিকিৎসাও। দরিদ্রদের চিকিৎসা করতে স্বয়ং সেই কলেজের প্রতিষ্ঠাতাই রোজ হাজির হতেন সেখানে।

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটে মেডিক্যাল কলেজের কথা শুনলে অবাক লাগাই স্বাভাবিক। তবে ১৯১৬ সালে সেখানেই গড়ে উঠেছিল ‘অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল’। আর তার নেপথ্যে ছিলেন ডঃ যামিনীভূষণ রায়। ভারত তো বটেই, গোটা এশিয়ার মধ্যেই সেটাই ছিল প্রথম আয়ুর্বেদিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আজ অবশ্য সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচিত জে.বি. রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ নামে। কিন্তু কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থাকার

পরেও বিকল্প আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল গড়ে তোলার কারণই কী? আর কে-ই বা ছিলেন জে.বি. রায়?

সালটা ১৮৭৯। অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায় জন্ম যামিনীভূষণের। বাবা পঞ্চানন রায় ছিলেন খুলনার নামকরা কবিরাজ। পূর্ববঙ্গে বড়ো হয়ে উঠলেও পরবর্তীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ভবানীপুরে ভাড়া বাড়িতে থেকেই চলত পড়াশোনা। স্নাতক পরীক্ষায় ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করার পর ভর্তি হলেন স্নাতকোত্তরেও। কিন্তু সংস্কৃতে যেন আর মন বসছে না কিছুতেই। কলকাতায় এসে তিনি ততদিনে ভালোই টের পেয়েছেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। জেদ চেপে বসল, চিকিৎসক হতে হবে তাঁকে।

সিদ্ধান্ত মতো করলেনও তেমনটাই। সংস্কৃতির পাঠ চুকিয়ে ১৯০২ সালে ভর্তি হলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। পাশাপাশি বাবার কাছেও চলতে থাকল আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পাঠ। ১৯০৫ সালে গোল্ড মেডেল নিয়েই ব্যাচেলর অফ মেডিসিন পাস করলেন যামিনীভূষণ। হয়ে উঠলেন ‘গাইনোকলজি এবং মিডওয়াইফারি’-র বিশেষজ্ঞ। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ হাসপাতালে চাকরির সুযোগ থাকলেও, সে পথে গেলেন না। ঠিক করে ফেললেন বাবার মতোই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হবেন তিনি।

বাড়ি থেকে আপত্তি তো এসেছিলই, সেইসঙ্গে সহপাঠীদের মধ্যেও উঠল ঠাট্টার রোল। শেষে কিনা আয়ুর্বেদ। এ পথে গেলে যে না খেতে পেয়ে মরতে হবে তাঁকে! যামিনীভূষণের সপাট উত্তর ছিল, ‘রোজগার না জুটলে পাঁচন বেচেই পেট চালাব’! প্রথাগত চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি এই বিতৃষ্ণাকে পাগলামি বলেই মনে হতে

পারে যে কারোর। তবে যামিনীভূষণের মতো করে ভাবলে বদলে যাবে দৃষ্টিভঙ্গিটাই। আসলে আজ যে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত ভারতে, সেই অ্যালোপ্যাথি এসেছে ব্রিটিশ শক্তির হাত ধরে। তারও বহু আগে থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল আয়ুর্বেদ। সেখানেই যে লুকিয়ে রয়েছে সংস্কৃতির শিকড়। আর অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্যলাভ হলেও, দীর্ঘস্থায়ী রোগকে বাগে আনা বেশ কঠিন এই চিকিৎসায়। সেখানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা দুরারোগ্য রোগকেও ধীরে ধীরে সারিয়ে তুলতে পারে বলেই বিশ্বাস ছিল তাঁর।

১৯০৬ সালে তিনি পুনরায় সংস্কৃত নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শুরু করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সঙ্গে উত্তর কলকাতার প্রথিতযশা কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের কাছে শুরু হল আনুষ্ঠানিক পঠনপাঠন। অন্যদিকে বগল মাড়োয়াড়ি হাসপাতালে শুরু করলে চিকিৎসাও। সে সময় তাঁর মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে। ডাক আসতে থাকল বরোদা, গোয়ালিয়র, কোচি রাজবাড়ি থেকে। নবাবদের থেকে মিলত বড়ো অঙ্কের আর্থিক অনুদান।

আজকের দিনের হিসাবে দেখতে গেলে এককথায় তিনি কোটিপতি হয়ে উঠেছিলেন তৎকালীন সময়ে। তবে বিলাসবহুল জীবন তাঁকে টানেনি কোনোদিনই। বরং, সেই টাকাতেই দরিদ্রদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন ‘বৈদ্যরাজ ফার্মাসি’। আধুনিক পদ্ধতিতে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি হত সেখানে। আর দরিদ্ররা সেই ওষুধ পেতেন বিনামূল্যেই। সেখানে রীতিমতো আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করা হয়। ভাবনা এল কলকাতায় কি এমন পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় না?

তার ঠিক পরের বছরই তিনি ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া নিয়ে শুধুমাত্র আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন বিশেষ হাসপাতাল তথা মেডিক্যাল কলেজ। সেই প্রথম ভারতের বুকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তার আগে বাড়িতেই আয়ুর্বেদের পাঠ দিতেন খ্যাতনামা কবিরাজরা। বছর নয়েক পড়ে তিনি নিজেই দীনেন্দ্র স্ট্রিটে গড়ে তুললেন আস্ত এক বাড়ি। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে সেখানেই উঠে এল ‘অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতাল’। পরে যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য তাঁর পৃথক এক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও তা আর হয়ে ওঠেনি। ১৯২৬ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সেই প্রয়াত হন তিনি।

মৃত্যুর আগে নিজের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিই তিনি দান করে গিয়েছিলেন জনকল্যাণে। নিজের তৈরি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার গবেষণাগার ও সংগ্রহশালা তো বটেই, পাতিপুকুরে ১২ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত বিশাল বাগানবাড়িও দান করে গিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে সেই বাগানবাড়িতেই ডঃ বিধানচন্দ্র রায় তৈরি করেন যক্ষ্মার হাসপাতাল। যা পাতিপুকুর টিবি হাসপাতাল বলেই পরিচিত।

তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে আজও অস্বীকার করা যায় না তাঁর অবদান। শিশুদের রোগ নির্ণয় হোক কিংবা টক্সিকোলজি— তাঁর লেখা বইগুলি প্রমাণ্য হয়েই রয়ে গেছে আজও। দিশা দেখিয়ে গিয়েছিলেন ইএনটি’র চিকিৎসার ক্ষেত্রেও। কিন্তু এমন এক ব্যক্তিত্বই আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অতলে। অদ্ভুত বিষয় হল, কিংবদন্তি এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের জন্মদিন ১ জুলাই-ই। হ্যাঁ, এই একই দিনে জন্ম বিধানচন্দ্রেরও। এও যেন এক অদ্ভুত সমাপতনই বটে...